**ATMADEEP**
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
**ISSN: 2454–1508**
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 812-818
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
**DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.072**

# মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও তৎকালীন কোচবিহারের সাহিত্যচর্চা

**কালিপদ বসুনিয়া,** *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 13.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

***Abstract***

*The Koch dynasty was founded in the sixteenth century by Maharaja Biswa Singha. The literary practice began in this region in the fourteenth-fifteenth century. From the reign of Maharaja Biswa Singha to that of Harendranarayan various works such as translated literature, Mangal Kavya, narrative poetry, Leela and Bhajan songs, Nat, Panchali and folklore etc were found. Literary works which flourished in the Cooch Behar Raj Sabha during the Sixteenth-seventeenth centuries came to a halt in the eighteenth centuries. It flourished again from the time of Maharaja Harendranarayan in the nineteenth century. The reign of Maharaja Harendranarayan is a bright chapter in the literary history of Cooch Behar State. He aecended the throne at a very young age when the state was in turmoil. To restore the situation, Queen Mother Kamteshwari Devi managed the kingdom with the support of the British government. Once Maharaja Harendranarayan reached maturity, he assumed full responsibility for governance. Maharaja Harendranarayan was proficient in Literature, art, music, and painting. He translated the Ramayana, Mahabharata, and the Puranas. Alongside his own literary creations, his patronage attracted many talented individuals to his court, transforming it into a hub of literary activity. During his reign, the royal court became the center of literary pursuits, including studies of the Ramayana, Mahabharata, Puranas, Mangal Kavya, history, philosophy, scriptures, and music. Through Maharaja Harendranarayan's initiatives, the Cooch Behar royal court contributed immensely to Bengali literature, leaving a lasting legacy.*

**Keywords:** Harendranarayan, Coochbehar, literature, Madhyayoug, Rajsava.

কামতায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকের গৌড়ের হোসেন শাহের আক্রমণে (আনুমানিক ১৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে) 'খেন' বংশের শেষ রাজা নীলাম্বর পরাজিত হলে 'খেন' বংশের অবসান ঘটে ও মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় কিছুটা অরাজক অবস্থা দেখা দিলে ভুঁইয়ারা স্বাধীন হয়ে নিজেদের

মধ্যেই আত্মকলহে লিপ্ত হন। সেই সুযোগে গোয়ালপাড়ার জেলার অন্তর্গত চিকনায় মেচ বংশের হরিদাস 'মন্ডল' নির্বাচিত হয়। হরিদাস মণ্ডলের এই চার পুত্র কোচ রাজ্যে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বিশ্বসিংহ (বিশু) কোচ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। বিশ্বসিংহের রাজত্বের কাল নির্ণয়ে সংশয় রয়েছে তবে খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ ১৪৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ ধরেছেন। বিশ্বসিংহ ক্রমে সৌমার রাজ্য, বিজনী, বিদ্যাগ্রাম, বিজয়পুর, ভোটরাজ্য আক্রমণ করে জয়লাভ করেন। তিনি চিকনা পর্বত থেকে রাজধানী কামতায় নিয়ে আসেন। কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠিতা হিসেবে বিশ্বসিংহের নামটি প্রতিষ্ঠিত। এরপর রাজা হন বিশ্বসিংহের পুত্র নরসিংহ কিন্তু পারিবারিক অন্তঃকলহের কারণে তাকে সিংহাসন ছাড়াতে হয়। নরসিংহের পর রাজা হয় তারই ভাই নরনারায়ণ। মহারাজা নরনারায়ণের ভাই শুক্লধ্বজ (চিলারায়) প্রবল পরাক্রমশালী বীর ছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় একের পর এক রাজ্য নরনারায়ণের অধিকৃত হয়। মহারাজা বিশ্বসিংহ থেকে মহারাজা জগদীপেন্দ্রনারায়ণ পর্যন্ত ২২ জন রাজা প্রায় সাড়ে-চারশো বছর কোচবিহার রাজ্যে রাজত্ব করেন। প্রাচীনকালে রাজ্যটি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল যেমন- 'প্রাগ্‌জ্যোতিষ', 'লৌহিত্য', 'কামরূপ', 'কামতা', 'কামতাবিহার' ইত্যাদি। সময়ের সাথে রাজ্যের নাম ও সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে। পরবর্তীকালে 'কোচবিহার' নামটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কামরূপের চারটি পীঠের মধ্যে কোচবিহার রত্নপীঠের অন্তর্গত। খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ তাঁর 'কোচবিহারের ইতিহাস' গ্রন্থে কোচবিহার নামের উৎপত্তি সম্পর্কে লিখেছেন "কোচ জাতির বাসস্থান বা বিহারক্ষেত্র হইতে কোচবিহার নামের উৎপত্তি; কোচকুমারী এবং মহাদেবের বিহারক্ষেত্র হইতে কোচবিহার নামের উৎপত্তি।"[১]

কোচবিহার রাজবংশে ১৭৮৩ থেকে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ রাজত্ব করেন। তিনি শৈশব অবস্থায় মাত্র তিন বছর বয়সে সিংহাসন লাভ করেন। সেসময় রাজ্যের সিংহাসন দখল নিয়ে চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি চলছিল। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ যেহেতু শিশু অবস্থায় ছিলেন তাই নাজির খগেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনের লোভে রাজমাতা ও শিশু মহারাজকে বন্দিকরে রাখে। এই অবস্থায় পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য রাজমাতা কামতেশ্বরী দেবী ইংরেজ সরকারকে সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখে পাঠান। ইংরেজ সরকারের সহায়তায় রাজমাতা কামতেশ্বরী দেবী রাজ্যের শাসন ফিরে পেলে নাবালক পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে রাজ্যে পরিচালনা করেন। মাহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ সাবালক হয়ে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাজ্যের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে আনার চেষ্টা করেন।

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ছোটবেলা থেকেই বাংলা, সংস্কৃত, পার্সী সহ অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। মুন্সি জয়নাথ ঘোষ তাঁর গৃহশিক্ষক হিসাবে ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সাহিত্য শাস্ত্র, সঙ্গীত চর্চায় বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করেন। তিনি নিজে যেমন সাহিত্য রচনা করেছিলেন তেমনি তাঁর রাজসভায় তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ও অনুগ্রহে বহু গুণী জ্ঞানী মানুষের সমাগম হয়েছিল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মঙ্গলকাব্য, ইতিহাস, দর্শন, শাস্ত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের চর্চা হয়েছিল সেখানে। মহারাজা নিজে শাক্তসংগীত রচনা করেছিলেন। হরেন্দ্রনারায়ণ ধর্মপরায়ণ মানুষ ছিলেন। তিনি নিজ হাতে বিভিন্ন মঠ-মন্দির নির্মাণ করেন যেমন কোচবিহার সাগরদীঘির পশ্চিমে হিরণ্যগর্ভ শিবমন্দির, আনন্দময়ী কালী মন্দির স্থাপন ইত্যাদি এছাড়াও তিনি কাশীতে করুণাময়ী কালী মন্দিরের সূচনা করেন। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ যে গ্রন্থগুলি রচনা করেন সেগুলি হল–

**মৌলিক রচনা:**

১. রাজপুত্র উপাখ্যান
২. উপকথা ৩. গীতাবলী

**অনুবাদ মূলক রচনা:**

১. রামায়ণের সুন্দরকাণ্ড
২. মহাভারতের ঐশিকপর্ব, সভাপর্ব, শল্যপর্ব, শান্তিপর্বের প্রেত উপাখ্যান
৩. ক্রিয়াযোগসার (পদ্মপুরাণের অনুবাদ)
৪. স্কন্দপুরাণের ব্রহ্মোত্তরখণ্ড
৫. বৃহদ্ধর্মপুরাণের মধ্যখণ্ড ও উত্তরখণ্ড

মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক দেব-দেবী মাহাত্ম্যমূলক সাহিত্যের বিপরীতে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার উদ্ভব ঘটে। নর-নারীর প্রেম সেখানে মুখ্য হয়ে উঠল। সামাজিক বিধি নিষেধের পরিবর্তে মানবহৃদয়বৃত্তি, প্রেমসম্ভোগ, অকাঙ্খার জয়গান গাইতে লাগল কবিরা। এই ভাবধারায় রচিত হরেন্দ্রনারায়ণের 'রাজপুত্র উপাখ্যান' ও 'উপকথা' গ্রন্থদুটি। 'রাজপুত্র উপাখ্যান', গ্রন্থটিতে চীন দেশের রাজা মদনসুন্দরের স্বপ্নে দেখা সুন্দরী নায়িকার রূপে মোহিত হয়ে রাজমন্ত্রী কর্তৃক সেই নায়িকার খোঁজা করা, মন্ত্রীর বুদ্ধিতে চিত্রকরের মাধ্যমে নায়িকার মনে মদনসুন্দরের প্রতি প্রেমের উদ্ভাবন ও মিলন বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীর পরবর্তী অংশে রাণীর জন্য চিত্রকরের দ্বারা গৃহের চিত্র নির্মাণ করতে এলে চিত্রকরের কন্যার সহিত রাজকুমারের হেয়ালি গল্পের মাধ্যমে প্রেমের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। রাজার সহিত দুই কন্যার প্রেম গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রন্থটি শুরু করেছেন মঙ্গলাচারণ, শিববন্দনা ও গ্রন্থাকারের পরিচয়ের মাধ্যমে। গ্রন্থের কাহিনী বর্ণনায়, চরিত্র সৃষ্টিতে, সহজ সরল ভাষায় কাহিনীটি বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। মন্ত্রীর চাতুর্যে কম্বোজ রাজকুমারীর মনে রাজার প্রতি প্রেম সৃষ্টির যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা উল্লেখযোগ্য। গল্পের কাহিনীতে বিবাহের আয়োজন থেকে রাজপ্রাসাদের বর্ণনায় বাঙালি ঘরের চিরপরিচিত ছবি আমাদের সামনে ফুটে ওঠে।

'উপকথা' গ্রন্থের বিষয় হল কলিঙ্গ দেশের রাজপুত্র আনন্দমোহন ও মন্ত্রীপুত্র আনন্দবিহারী একে অপরের খুব ভালো বন্ধু। দুই বন্ধুর বিয়ে হয় সৈন্ধবদেশের রাজকন্যা রাকামুখীর সঙ্গে আনন্দমোহনের ও মন্ত্রীকন্যা সুশীলার সঙ্গে অনন্দবিহারীর। স্ত্রী রাকামুখীর হাতে রাজপুত্রের মৃত্যু হলেও বন্ধু ও বন্ধুর স্ত্রীর সাহায্যে প্রাণ ফিরে পায়। পরবর্তী অংশে অপ্সরার দ্বারা রাজপুত্রের স্বপ্নে স্বপ্নাবতীর রূপদর্শন ও রাজপুত্রের নানা পরীক্ষার মাধ্যমে মিলন বর্ণিত হয়েছে। গল্পের কাহিনী, নায়িকার রূপ বর্ণনায়, ছন্দের ব্যবহারে গ্রন্থ দুটিতে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ দেবদেবীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনি শক্তির সাধনা করতেন ও শাক্তসংগীত রচনা করেছিলেন। প্রাপ্ত পুথিতে তাঁর গানের সংখ্যা ১৭৮ টি। পুথিটি শরচ্চন্দ্র ঘোষালের সম্পাদনায় কোচবিহার সাহিত্যসভা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। যার মধ্যে আগমনী গানের সংখ্যা ১৩ টি আর বাকি সবগুলোই কালী বিষয়ক গান। এই গানগুলি হল- জগজ্জননীর রূপ, মাতৃস্বরূপ, নাম মহিমা, মনোদীক্ষা, ভক্তের আকুতি, ইত্যাদি। তাঁর আগমনী বিষয়ক পদগুলিতে কন্যা উমার জন্য মায়ের দুশ্চিন্তা ,স্বপ্নদর্শ , মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতায়চিরন্তন বাঙালি মা য়ের চিত্র ফুটে উঠেছে। মা মেনকা ব্যাকুল হৃদয়ে স্বামী হিমালয়কে জানাচ্ছেন-

'নগেন্দ্র চরণ করিয়া বন্দন মেনকা রাণী
কান্দিয়া কহিছে নয়ন বহিছে পরাণ দহিছে স্মর্যা নন্দিনী
শুন নগেন্দ্র নিবেদি তোমারে
আন যাইয়্যা আমার উমা মারে, দেখিতে চাই তারে।'[২]

তাঁর কালী বিষয়ক পদগুলিতে মায়ের প্রতি খেদ প্রকাশ পেয়েছে। সংসারের সুখ দুঃখ থেকে মুক্তির ব্যাকুলতায় কালী নাম জপ করতে করতে দেহত্যাগ করার বাসনা প্রকাশ করেছেন-

'বল সুখে তারা মুখে জপ হৃদে কালী নাম।
এহি সে পরম তপ অন্য তাপে কিবা কাম।
এদিন কি এভাবে যাবে এ তনু পঞ্চত্ব পাবে।
এ বিভাব কোথা রবে মন যাইতে হবে যমধাম।'[৩]

ভক্তের আকুতি পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ কমলাকান্তের সমসাময়িক ছিলেন। হরেন্দ্রনারায়ণ ভক্তের আকুতি পর্যায়ের ৬৬ টি পদ রচনা করেছেন। কবির আবেগ, অনুভূতি, ব্যাক্তিগত জীবনে ভোগ ঐশ্বর্যের অন্তরালে হতাশা সবই শ্যামা মায়ের কাছে খেদ করে জানিয়েছেন। হরেন্দ্রনারায়ণের পদগুলিতে শব্দালংকার, উপমা, রূপকের ব্যবহারে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের কবিত্ব প্রতিভার উৎকৃষ্ট নিদর্শন তাঁর রচিত শাক্ত পদগুলি।

হরেন্দ্রনারায়ণের পুরাণের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। সংস্কৃত পুরাণকে সর্বজন বোধগম্য করে তোলার জন্য রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের অনুবাদ করতেন। তিনি রামায়ণের সুন্দরকাণ্ড অনুবাদ করেন। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের এই গ্রন্থটি শরচ্চন্দ্র ঘোষালের সম্পাদনায় কোচবিহার সাহিত্যসভা থেকে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের অনুবাদের ক্ষেত্রে মুলত বাল্মিকি রামায়ণকে অনুসরণ করলেও কিছু ক্ষেত্রে কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আকারে কৃত্তিবাসের তুলনায় হরেন্দ্রনারায়ণের সুন্দরকাণ্ড বৃহৎ। গ্রন্থের শুরুর দিকের তিনি কোচবিহার রাজবংশের পূর্বপুরুষ ও নিজের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে-

'কামতা বনিতা পতি বিশ্বসিংহ খিতিপতি
শিবশুত হীরাগর্ভে জাত।
অরি-করি-বিদারন ঘোর রন-পঞ্চানন
জশ জার জগত বিক্ষাত।।
সে অংশে মম জাত শ্রীহরেন্দ্র নামে ক্ষাত
দুরিত পুরিত জার মতি।...'[৪]

হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থে বিভীষণ রাবণের কাছ থেকে কুবের ও মহাদেবের নিকট গমন করলে তাঁদের উপদেশ অনুযায়ী রামের স্মরণ নেওয়ার ঘটনা বাল্মীকি রামায়ণে পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাসের রামায়ণে আমরা এই ঘটনার উল্লেখ পাই। এছাড়াও কিছু অংশে কৃত্তিবাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মূল রামায়ণে থেকে সরে এসে কাহিনীতে নতুনত্ব সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ মহাভারতের চারটি পর্বের অনুবাদ করেন এই অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মহাভারতকে অনুসরণ করেছেন। তবে আক্ষরিক অনুবাদের পরিবর্তে সারানুবাদকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বৃহদ্ধর্ম পুরাণের মধ্যখণ্ড ও উত্তরখণ্ড এবং পদ্মপুরাণের

ক্রিয়াযোগসার অংশটির আনুবাদ করেন। তিনি মূলত সংস্কৃত থেকেই অনুবাদ করছেন। কোচবিহার রাজবংশের দীর্ঘ ইতিহাসে আর কোন মহারাজা এত বিপুল সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না।

কোচবিহার রাজ্যে সেসময় মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের রাজসভা ছিল সাহিত্য চর্চার কেন্দ্রভূমি। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মঙ্গলকাব্য, ইতিহাস, দর্শন, শাস্ত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের চর্চা হয়েছিল সেখানে। বাংলার আর কোনো রাজসভায় এত বিপুল পরিমাণ সাহিত্যচর্চা দেখা যায় না। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে তাঁর রাজসভার কবিদের দিয়ে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের অনুবাদ করিয়ে নিয়েছিলেন। হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে যে রচয়িতাদের রচনার সন্ধান পাওয়া যায় তা মৌলিক ও অনুবাদ সাহিত্য এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। মৌলিক গ্রন্থগুলি হল- রাম নারায়ণের 'নলদময়ন্তী উপাখ্যান', জগৎদুর্লভ বিশ্বাসের 'সঙ্গীত শঙ্কর', দ্বিজ ভূতনাথের 'ষড়ঋতু বর্ণনা', দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদের 'গীতাবলী', নরসিংহদাসের 'হংসদূত', দ্বিজ ভগীরথের 'তুলসীমাহাত্ম্য', গোপালদাস 'কামশাস্ত্র', জয়নাথ ঘোষের 'রাজোপাখ্যান', রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগীর 'গোসানীমঙ্গল'।

মহারাজা হরেন্দ্রণারায়নের অনুপ্রেরণায় মুন্সী জয়নাথ ঘোষ 'রাজোপাখ্যান' গ্রন্থটি রচনা করেন। গদ্যে রচিত গ্রন্থটিতে কোচবিহার রাজবংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। গ্রন্থটিকে বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার প্রথম গ্রন্থ বলা যেতে পারে। গ্রন্থটিকে তিনটি খণ্ডে বিন্যস্ত করে একান্নটি অধ্যায়ে সমাপ্ত করেছেন। প্রথম খণ্ডের নাম দিয়েছেন 'দেবখণ্ড'। এই খণ্ডে হীরাদেবীর জন্ম থেকে মহারাজা বিশ্বসিংহের রাজ্য শাসন পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত হয়ছে। 'নরখণ্ডে' নরনারায়ণ থেকে ধৈয্যেন্দ্রনারায়ণ পর্যন্ত কোচবিহারের রাজাদের শাসনকাল বর্ণনা করেছেন। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সময়ে যেহেতু জয়নাথ ঘোষ বর্তমান ছিলেন তাই 'প্রত্যক্ষ খণ্ড' নাম দিয়ে হরেন্দ্রনারায়ণের ব্যাক্তিজীবন, সাহিত্যকর্ম, রাজত্বকাল থেকে শিবেন্দ্রনারায়ণ পর্যন্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটি শুধু ইতিহাস চর্চায় নয় বাংলা গদ্যচর্চায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র রাজসভার মধ্যেই নয় রাজসভার বাইরেও বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। রাজসভার বাইরে রাধাকৃষ্ণ দাসবৈরাগী 'গোসানীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি কোচবিহারের অন্তর্গত গোসানীমারী অঞ্চলে রাজা কান্তেশ্বরের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই কাব্যে ততকালীন সামাজিক অবস্থা, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, রাজনৈতিক অবস্থান ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়াও অন্যান্য যেসকল মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেগুলিতে রচয়িতাদের কৃতিত্বের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

অনুবাদমূলক গ্রন্থের মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও পুরাণের অনুবাদ পাওয়া যায়। কোচবিহার রাজসভায় রামায়ণের চর্চা শুরু হয় ষোড়শ শতকে। এরপর প্রায় দুশ বছর রামায়ণের চর্চা দেখতে পাই না'। উনিশ শতক থেকে পুনরায় চর্চা শুরু হয়। রামায়ণের আদিকাণ্ড বাদে বাকি ৬টি কাণ্ডের অনুবাদ পাওয়া যায়। রামায়ণের অনুবাদ করেন দেবীনন্দন 'কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড', সারদানন্দ 'উত্তরকাণ্ড', শতানন্দ 'উত্তরকাণ্ড', দ্বিজ ব্রজসুন্দর 'লঙ্কাকাণ্ড', দ্বিজ রঘুরাম 'উত্তরকাণ্ড', 'অযোধ্যাকাণ্ড', 'কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড', শ্রীনাথ দ্বিজ 'কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড', রুদ্ররামশর্মা 'আরণ্যকাণ্ড'। সারানুবাদ ও ভাবানুবাদের ক্ষেত্রে রচয়িতারা মূলের প্রতি জোর দিয়েছেন। কাহিনীর নিসর্গ বর্ণনায় কবিরা কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়েছেন।

রামায়ণের তুলনায় সে সময়ে বিপুল পরিমাণ মহাভারত ও পুরাণের অনুবাদ হয়। মহাভারতের মোট ১৩ টি পর্বের অনুবাদ পাওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারত উভয় ক্ষেত্রেই একই কবি যেমন বিভিন্ন পর্বের অনুবাদ

করেছেন তেমনি একই পর্ব অনুবাদে একাধিক কবি যুক্ত ছিলেন। কোনো একজন অনুবাদকের দ্বারা সম্পূর্ণ পর্ব অনুবাদ করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। মহাভারতের যে অনুবাদগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হল– দ্বিজ মনোহর 'বনপর্ব', দ্বিজ বলরাম 'বনপর্ব', দ্বিজ রুদ্রদেব 'আদিপর্ব', পণ্ডিত মাধবানন্দ 'বনপর্ব', সারদানন্দ 'কাশীখণ্ড', সতানন্দ 'কাশীখণ্ড', দ্বিজ ব্রজসুন্দর 'সভাপর্ব', দ্বিজ রঘুরাম 'বনপর্ব', 'ভীষ্মপর্ব', 'সভাপর্ব', 'শান্তিপর্ব', দ্বিজ লক্ষ্মীরাম 'কর্ণপর্ব', 'শল্যপর্ব', দ্বিজ বৈদ্যনাথ 'বনপর্ব', 'মৌষলপর্ব', 'শান্তিপর্ব', দ্বিজ মহীনাথ 'বনপর্ব', 'অশ্বমেধপর্ব', 'প্রস্থানিকপর্ব', মাধবচন্দ্র শর্মা 'স্বর্গারোহণপর্ব', দ্বিজ রামনন্দন 'গদাপর্ব', 'শল্যপর্ব', জয়দেব দ্বিজ 'সভাপর্ব'। কোচবিহার রাজসভায় যে পরিমান মহাভারতে অনুবাদ হয়েছিল আর কোনো রাজসভায় এত বিপুল পরিমাণ মহাভারতের অনুবাদ দেখা যায় না।

এছাড়াও ভাগবত ও পুরাণের যে অনুবাদ পাওয়া যায় সেগুলি হল– দ্বিজ জগন্নাথ 'ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধ', সারদানন্দ 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ', সতানন্দ 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ', দ্বিজ ব্রজসুন্দর 'নৃসিংহপুরাণ', 'কালিকাপুরাণ', দ্বিজ রঘুরাম 'ক্রিয়াযোগসার', দ্বিজ বৈদ্যনাথ 'কালিকাপুরাণ', 'শিবপুরাণ', 'পদ্মপুরাণ', 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড', দ্বিজ রামনন্দন 'কালিকাপুরাণ', 'ধর্মপুরাণ', 'নৃসিংহপুরাণ', দ্বিজ কীর্ত্তিচন্দ্র 'কালিকাপুরাণ', দ্বিজ রামচন্দ্র 'কালিকাপুরাণ' রিপুঞ্জয় দাস 'ক্রিয়াযোগসার' প্রভৃতি।

মধ্যযুগের শেষ ও আধুনিক যুগের সূচনাপর্বে দাড়িয়ে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের উদ্যোগে ও উৎসাহে কোচবিহার রাজসভায় যে বিপুল পরিমাণ সাহিত্যের চর্চা হয়েছিল তাঁর অবদান বাংলা সাহিত্যে অপরিসীম।

**তথ্যসূত্র:**

১। খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ, কোচবিহারের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, ২০১৯, পৃ-৪।

২। ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল (সম্পা.), মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও শিবেন্দ্রনারায়ণের ভক্তিগীতি-সংগ্রহ, অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ-৫৭।

৩। ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল (সম্পা.), মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও শিবেন্দ্রনারায়ণের ভক্তিগীতি-সংগ্রহ, অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ-৮১।

৪। শরচ্চন্দ্র ঘোষাল (সম্পা.), কোচবিহার সাহিত্যসভা গ্রন্থাবলী, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী (পঞ্চম খণ্ড), সুন্দরকান্ড রামায়ণ, কোচবিহার সাহিত্যসভা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃ-২

**গ্রন্থপঞ্জি:**

১। ঘোষাল শরচ্চন্দ্র (সম্পা.), কোচবিহার সাহিত্যসভা গ্রন্থাবলী সংখ্যা-১, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড), গীতাবলী, কোচবিহার সাহিত্যসভা, প্রথম সংস্করণ, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ।

২। ঘোষাল শরচ্চন্দ্র (সম্পা.), কোচবিহার সাহিত্যসভা গ্রন্থাবলী সংখ্যা-২, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), ক্রিয়াযোগসার, কোচবিহার সাহিত্যসভা, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ।

৩। ঘোষাল শরচ্চন্দ্র (সম্পা.), কোচবিহার সাহিত্যসভা গ্রন্থাবলী-৪, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী (তৃতীয় খণ্ড), উপকথা, কোচবিহার সাহিত্যসভা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

৪। ঘোষাল শরচ্চন্দ্র (সম্পা.), কোচবিহার সাহিত্যসভা গ্রন্থাবলী সংখ্যা-৫, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী (চতুর্থ খণ্ড), উপকথা, কোচবিহার সাহিত্যসভা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

৫। ঘোষাল শরচ্চন্দ্র (সম্পা.), কোচবিহার সাহিত্যসভা গ্রন্থাবলী, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী (পঞ্চম খণ্ড), সুন্দরকান্ড রামায়ণ, কোচবিহার সাহিত্যসভা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ।

৬। দাস বৈরাগী রাধাকৃষ্ণ, গোসানী মঙ্গল (শ্রীহরিশ্চন্দ্র পাল সম্পাদিত), ত্রিবৃত্ত প্রকাশন, ত্রিবৃত্ত সরণি, কোচবিহার, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ।

৮। ঘোষ মুন্সী জয়নাথ, রাজোপাখ্যান (বিশ্বনাথ দাস সম্পাদিত), দি সী বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৪২৮ (২০২১ খ্রিঃ)।

**সহায়ক গ্রন্থ:**

১। বন্দ্যোপাধ্যায় ভগবতীচরণ, কোচবিহারের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, নভেম্বর ২০২১।

২। রায় ড. শচীন্দ্র নাথ, সাহিত্য সাধনায় রাজন্য শাসিত কোচবিহার, এন.এল পাবলিশার্স শিবমন্দির, শিলিগুড়ি, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

৩। রায় স্বপনকুমার, কোচবিহার রাজদরবারের সাহিত্যচর্চা, বুকস ওয়ে, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১।

৪। রায় দীপক কুমার (সম্পা.), মধ্যযুগের সাহিত্য কোচবিহার রাজদরবার, ছায়া পাবলিকেশন, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০১৫।

৫। দেব রণজিৎ, সাহিত্যের ইতিহাসে কোচ-রাজদরবার, তুহিনা প্রকাশনী, কলকাতা-০৬, অক্টোবর ২০২২।

৬। পাল ড. নৃপেন্দ্রনাথ (সম্পা.), বিষয় কোচবিহার, অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, বৈশাখ ১৪০১ বঙ্গাব্দ।

৭। সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড), আনন্দ, কলকাতা-০৯, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।

৮। বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ষষ্ঠ খণ্ড), মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, ২০১০-২০১১।

৯। রায় দীপক কুমার (সম্পা.), কোচবিহার রাজদরবারের পুথি পরিচয়, ছায়া পাবলিকেশন, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৪২১ বঙ্গাব্দ।

১০। পাল ড. নৃপেন্দ্রনাথ (অনুবাদ), রাজ্য কোচবিহারের রাজকাহিনী (দ্বিতীয় খণ্ড) লেখক: হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

১২। দাস বিশ্বনাথ, কোচবিহারের পুরাকীর্তি, দি সী বুক এজেন্সী, কলকাতা-০৭, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০২২।